মহাপ্রভু ও বাংলার নারীমুক্তি

শাস্ত্রীয় নিগড় থেকে লোকায়ত আধ্যাত্মিক সমানাধিকারের বিবর্তন

শ্রী অজয়কুমার দে (প্রণবনন্দন)
গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

মহাপ্রভু ও বাংলার নারীমুক্তি

“ শাস্ত্রীয় নিগড় থেকে লোকায়ত আধ্যাত্মিক সমানাধিকারের বিবর্তন “

শ্রী অজয় কুমার দে (প্রণবনন্দন) গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

....

উৎসর্গ :

উৎসর্গিত হলো—
সেই সকল নামহীন ও অগণিত বাংলার নারীশক্তির চরণে, যাঁরা মধ্যযুগের শাস্ত্রীয় নিগড় ভেঙে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্লাবনে খুঁজে নিয়েছিলেন নিজেদের আধ্যাত্মিক ও মানবিক অধিকার। এবং, আমার গবেষণার অন্তহীন প্রেরণা ও আলোকবর্তিকা স্বরূপ— পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর শ্রীচরণকমলে।

॥ মঙ্গলাচরণ ও নিবেদন ॥

“পাণ্ডিত্যং যস্য গৌরস্য ভক্তি-গদাধরাত্মকম্।

শ্রীপাট-ভরতপুর-ধাম্ণে তস্মৈ পণ্ডিতায় নমো নমঃ॥”

পরম করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শক্তি ও রাধাভাবের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীচরণকমলে সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি। মুর্শিদাবাদের পুণ্যভূমি ভরতপুর, যা শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এক মহাতীর্থ, সেই শ্রীপাটের ধূলিকণা অঙ্গে মাখিয়েই এই বিশেষ অধ্যায়ের অবতারণা।

বৈষ্ণব দর্শনে 'গদাধর-চৈতন্য' অভিন্ন সত্তা। শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের কঠোর আবরণ ভেদ করে ভক্তির যে অন্তঃসলিলা প্রবাহ তিনি ভরতপুরের মাটিতে প্রবাহিত করেছিলেন, তা আজও লোকায়ত আধ্যাত্মিকতার এক জীবন্ত নিদর্শন।

নিবেদন:

আমার এই ক্ষুদ্র গবেষণার মূল সুর হলো–'শাস্ত্রীয় নিগড় থেকে লোকায়ত মুক্তি'। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত কেবল এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রেমের সেই নিভৃত কুঞ্জ, যেখানে শুষ্ক শাস্ত্রীয় অনুশাসন ভক্তির বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। ভরতপুরের এই শ্রীপাটে শ্রীমদ্ভাগবতের যে রসাস্বাদন তিনি করতেন, তাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের আধ্যাত্মিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিশেষ করে বাংলার নারীমুক্তির ইতিহাসে গদাধর পণ্ডিতের 'রাধাভাব' এক অনন্য দর্শন। আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে গেলে যে লৌকিক লিঙ্গপরিচয় তুচ্ছ, এবং 'সেবাভাব' বা 'নারী-সুলভ কোমল ভক্তি' যে শ্রেষ্ঠ–তা গদাধর পণ্ডিতের জীবনের মাধ্যমে ভরতপুরের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত হয়েছিল।

এই শ্রীপাটের ধন্য স্মৃতি ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের চরণে আমার এই লেখনী উৎসর্গ করলাম। তাঁর কৃপায় যেন এই গবেষণাপত্র বাংলার লোকসংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের এক সঠিক দর্পণ হয়ে উঠতে পারে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু গদাধর পণ্ডিত।
ভরতপুর-ধাম-বাসী ভক্তগণ-আনন্দিত।।"

বিনীত নিবেদক,

শ্রী অজয়কুমার দে (প্রণবনন্দন)

গবেষক ও সাহিত্যিক

সারসংক্ষেপ : এই গবেষণা প্রবন্ধটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করে। একদিকে স্মৃতিশাস্ত্র ও পিতৃতান্ত্রিক কঠোরতা কীভাবে নারীর অধিকারকে সংকুচিত করেছিল এবং অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলন ও লোকসংস্কৃতি কীভাবে নারীর মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিল—ইহা তাহার একটি তুলনামূলক চিত্র। বৈষ্ণব ধর্ম, সুফিবাদ এবং মৈমনসিংহগীতিকার ন্যায় লোকজ ঐতিহ্যের আলোকে নারীর মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক বৈপ্লবিক পর্যায় এখানে আলোচিত হয়েছে।

ভূমিকা : বাঙালি সংস্কৃতির অন্তঃশলিলা প্রবাহটি সর্বদা তার লোকায়ত ও মানবিক ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ-মানস যখন একদিকে নব্য-স্মৃতির কঠোর অনুশাসন এবং পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীলতার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তখন নারীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে নারীর ব্যক্তিসত্তা যখন কেবলমাত্র অন্তঃপুরের চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলন এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে।

মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্ম কেবল একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ ছিল না; বরং এটি ছিল শৃঙ্খলিত মানবতার মুক্তির এক অবারিত আহ্বান। সংকীর্তনের উদার আঙিনায় জাতি-ধর্ম-বর্ণের পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্যের প্রাচীর ভেঙে তিনি যে আধ্যাত্মিক সমানাধিকারের বীজ বপন করেছিলেন, তা বাংলার সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। এই আন্দোলনের সমান্তরালে সুফিবাদ এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মতো লোকজ আখ্যানগুলো নারীর মানবিক মর্যাদা ও আবেগের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল, তা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে ছিল প্রকৃত অর্থেই বৈপ্লবিক।

বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে শাস্ত্রীয় কঠোরতা বনাম লোকায়ত আধ্যাত্মিকতার এই দ্বান্দ্বিক বিবর্তন এবং বাংলার নারীমুক্তির পথে মহাপ্রভুর দর্শনের প্রভাবকে একটি তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ: শাস্ত্রীয় নিগড় ও নারীর অবদমন :-

বৈদিক যুগ হইতে স্মার্ত যুগের বিবর্তন-বাংলার তথা ভারতের সামাজিক ইতিহাসে নারীর অবস্থান সর্বদা একরৈখিক ছিল না। ঋগ্বেদীয় যুগে অপালা, ঘোষা বা বিশ্ববারার ন্যায় বিদুষী নারীর কথা জানা গেলেও, পরবর্তী বৈদিক যুগে এবং বিশেষ করিয়া সংহিতা ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে নারীর অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হইতে থাকে। প্রাচীন বঙ্গদেশে পাল ও সেন রাজবংশের শাসনকালে এই শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি এক কঠোর সামাজিক বিধানে পরিণত হয়।
শাস্ত্রীয় নিগড়: পরাধীনতার শৃঙ্খল- স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ নারীর জীবনকে পুরুষের অভিভাবকত্বের অধীনে রাখিবায় জন্য কঠোর বিধান দিয়াছিলেন। মনুস্মৃতির একটি অত্যন্ত আলোচিত ও বিতর্কিত শ্লোক এই প্রথাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে:

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।

পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥" [১]

অর্থাৎ: বাল্যকালে পিতার বশে, যৌবনে পতির বশে এবং পতির মৃত্যুর পর পুত্রের বশে থাকিবে; নারী কখনো স্বাধীনতার যোগ্য নহে।

এই বিধান কেবল আধ্যাত্মিক ছিল না, ইহা ছিল নারীর সম্পত্তির অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার মূলে কুঠারাঘাত। মধ্যযুগের বঙ্গসমাজে রঘুনন্দনের 'অষ্টবিংশতিতত্ত্ব' এই নিয়মাবলীকে আরও কঠোর করিয়া তুলে।

আধ্যাত্মিক পরাধীনতা ও মুক্তিলাভের অন্তরায় :মধ্যযুগের সমাজপতিগণ কেবল সামাজিক নহে, নারীর পারমার্থিক অধিকারকেও শৃঙ্খলিত করিয়াছিলেন। যজ্ঞ বা পূজা-পার্বণে নারীর একক কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী:

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।

পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়ত॥" [২]

অর্থাৎ: পতি ব্যতীত নারীর পৃথক কোনো যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাসের প্রয়োজন নাই; কেবল পতিসেবার মাধ্যমেই তিনি স্বর্গলাভ করিতে পারেন।

ইহা ছিল নারীর স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সত্তার চূড়ান্ত অস্বীকৃতি। পতির সেবাকেই নারীর একমাত্র মোক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক অবদমন: বেদাধ্যয়নে নিষেধাজ্ঞা-শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নারীর জ্ঞানার্জনের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল। বেদাধ্যয়ন বা গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ নারীর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। শাস্ত্রীয় বচন ছিল:

"স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়তাম্।" [৩]

অর্থাৎ: নারী ও শূদ্রের বেদ পাঠ করা নিষিদ্ধ।

এই ব্যবস্থার ফলে নারী কেবল গৃহকর্মের কারখানায় পরিণত হন। সেন যুগে বল্লাল সেনের 'কৌলীন্য প্রথা'র প্রভাবে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন হয়, যেখানে নারী কেবল বংশ রক্ষার উপাচার হিসেবে ব্যবহৃত হইতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক বিবাহ করিতেন, এবং সেই সকল হতভাগ্য নারীদের জীবন পতিহীন একাকীত্বে কাটিয়া যাইত।

সম্পত্তি ও অধিকার হরণের লৌকিক যুক্তি-নারীকে কেবল ‘রক্ষণীয়া’ বা ‘ভোগ্যা’ হিসেবে প্রতিপন্ন করিবার জন্য মহাকাব্যিক যুগেও কিছু কঠোর উক্তি সংযোজিত হইয়াছিল। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বলা হইয়াছে:

"ন স্ত্রীভ্যঃ কিঞ্চিদ্যদন্যৎ পাপকৃত্তমমস্ত্যত।

স্ত্রীয়োহি মূলং দোষাণাং তথা ত্বমপি বেত্থ হ॥" [৪]

অর্থাৎ: নারীর অপেক্ষা অধিক পাপকারী আর কেহই নাই; নারীই সকল দোষের মূল—ইহা তুমিও জানো।

এই প্রকার চরম নারীবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গিই মধ্যযুগীয় বঙ্গসমাজে কৌলীন্য প্রথা ও সতীদাহের ন্যায় অমানবিক প্রথাকে জায়েজ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থান বাংলার লোকায়ত সহজ জীবনকে ধ্বংস করিয়াছিল [৫]। পাল যুগে যেখানে নারীরা শ্রম ও শিল্পে অংশ লইতেন, সেন যুগে তাঁহাদিগকে ‘অবরোধবাসিনী’ করিয়া তোলা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইল:

"সুগুপ্তাং হি রক্ষিতুং শক্যা নার্য ইতি মতির্মম।" [৬]

অর্থাৎ: নারী কেবল সুগুপ্ত স্থানে (অন্দরমহলে) থাকিলেই সুরক্ষিত থাকে।

পাল যুগের ব্যতিক্রম: তান্ত্রিক ও সহজিয়া বৌদ্ধমত-পাল যুগে (৭৫০-১১৬১ খ্রি.) বৌদ্ধ সহজযানের প্রাবল্যে নারীর একপ্রকার গূঢ় আধ্যাত্মিক অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। চর্যাপদের পদকর্তাগণ 'ডোম্বী' বা 'শবরী' চরিত্রকে 'নৈরাত্মা' বা 'শূন্যাতা'র প্রতীক রূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

"ডোম্বীবিএ জলোঁ সাসু ঘরু ঘালি।" [৭]

অর্থাৎ: ডোমিনী বা শবরী সেই সত্তা, যিনি সামাজিক গৃহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন।

যদিও ইহা ছিল উচ্চতর আধ্যাত্মিক সাধনার রূপক, তথাপি লৌকিক সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল নগণ্য। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানে এই সহজিয়া নারী-মুক্তির পথও রুদ্ধ হইয়া যায়।

শাস্ত্রীয় অবমাননা ও স্বভাবজাত দোষের আরোপ-মধ্যযুগের সমাজপতিগণ নারীর স্বভাবকে অবমাননা করিবার জন্য বিবিধ শ্লোক উদ্‌ধৃত করিতেন। চাণক্যনীতিতে বলা হইয়াছে:

"অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা।

অশৌচত্বং নির্দয়ত্বং স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ॥" [৮]

অর্থাৎ: মিথ্যাচার, হঠকারিতা, মায়া, মূর্খতা, লোভ, অপবিত্রতা ও নির্দয়তা—এইগুলি নারীর স্বভাবজাত দোষ।

এইরূপ অপপ্রচারের ফলে নারীর আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রতিপত্তি সমূলে বিনষ্ট হয়। সতীদাহ প্রথার ন্যায় অমানবিক প্রথাকেও শাস্ত্রীয় অলঙ্কারে ভূষিত করা হইয়াছিল। তবে এই অন্ধকারের মাঝেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিযোগ [৯] এবং পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সাম্যবাদী দর্শন [১০] নারীর আধ্যাত্মিক সমানাধিকারের এক ক্ষীণ আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল (১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক জটিল সময়। একদিকে সুলতানি শাসনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অন্যদিকে রঘুনন্দনের স্মার্ত শাসনের কঠোর বিধান—এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রমাণসহ মহাপ্রভুর জন্মলগ্নে নারীদের অবস্থানের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

সামাজিক ব্যাধি: কৌলীন্য ও বহুবিবাহ- বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা মহাপ্রভুর জন্মলগ্নে এক বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল।

- **বহুবিবাহ**: কুলীনত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনেক সময় শতাধিক কিশোরীকে বিবাহ করতেন।
- **অকাল বৈধব্য**: এই অসম বিবাহের ফলে সমাজে বিধবাদের সংখ্যা ছিল বিপুল। বিধবা নারীদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও লাঞ্ছনার ইতিহাস।

শাস্ত্রীয় নিগড় ও 'অবরোধ' প্রথা

মহাপ্রভুর জন্মলগ্নে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে নারীদের ঘরের বাইরে আসা বা পরপুরুষের সম্মুখীন হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। একে বলা হতো '**অবরোধ প্রথা**'।

- **প্রমাণ**: বৃন্দাবন দাসের *'চৈতন্যভাগবত'* থেকে জানা যায়, অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতা দেবী যখন নবজাতক নিমাইকে দেখতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তা ও আবরণের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।
- **স্মার্ত শাসন**: তৎকালীন সমাজপতি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁর 'অষ্টবিংশতিতত্ত্ব' গ্রন্থে নারীর চলাফেরা ও আচরণের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন। নারীর স্বতন্ত্র কোনো সামাজিক অস্তিত্ব তখন স্বীকৃত ছিল না।

কৌলীন্য প্রথার অভিশাপ ও বহুবিবাহ - সেন যুগে শুরু হওয়া কৌলীন্য প্রথা পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে এসে এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। কুলীন ব্রাহ্মণদের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে নারীরা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতেন।

- **অসম বিবাহ**: একজন ৭০-৮০ বছরের বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সাথে ৫-৬ বছরের কিশোরীর বিবাহ দেওয়া ছিল সাধারণ ঘটনা।
- **প্রমাণ**: ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের *'বাঙালীর ইতিহাস'* এবং দীনেশচন্দ্র সেনের *'বৃহৎ বঙ্গ'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক বিবাহ করতেন। এই নারীরা পিত্রালয়েই থাকতেন এবং স্বামী কেবল মাঝে মাঝে 'দক্ষিণা' আদায়ের জন্য আসতেন। একে বলা হতো '**কুলীন কন্যাদের বৈধব্য-পূর্ব বৈধব্য**'।

শিক্ষার অধিকার হরণ-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন বা শাস্ত্রপাঠ তখন মহাপাপ হিসেবে গণ্য হতো।

- **প্রমাণ**: *'চৈতন্যভাগবত'* ও *'চৈতন্যচরিতামৃত'* পাঠ করলে দেখা যায়, তৎকালীন নবদ্বীপে শত শত টোল বা চতুষ্পাঠী থাকলেও সেখানে কোনো নারী শিক্ষার্থীর উল্লেখ নেই।
- **বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ব্যতিক্রম**: মহাপ্রভুর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে অর্জিত। সাধারণ নারীর জন্য "**স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়তাম্**" (নারী ও শূদ্রের জন্য শিক্ষা নিষিদ্ধ) এই নীতিই প্রবল ছিল।

ধর্মীয় বঞ্চনা ও লৌকিক ব্রতের উদ্ভব- শাস্ত্রীয় যজ্ঞ বা পূজায় নারীর কোনো স্বতন্ত্র অধিকার ছিল না। এই বঞ্চনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন লৌকিক দেবী ও ব্রতকথা।

- **প্রমাণ**: ড. সুকুমার সেনের মতে, এই সময়েই **'মঙ্গলকাব্য'**-এর প্রসার ঘটে। নারীরা নিজেদের দুঃখ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে মনসা, চণ্ডী বা শীতলার ব্রত পালন শুরু করেন।
- স্বামীর মঙ্গলকামনা বা পুত্রসন্তান লাভের জন্য 'ষষ্ঠী ব্রত' বা 'ইতু পূজা'র মতো লৌকিক আচারই ছিল নারীর প্রধান ধর্মীয় অবলম্বন।

সতীদাহ ও বৈধব্যের নিদারুণ যন্ত্রণা - তৎকালীন সমাজে পতিহীন নারীর জীবন ছিল জীবন্ত মৃত্যুর সমান।

- **সতীদাহ**: স্মৃতিশাস্ত্রের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সতীদাহ প্রথাকে উৎসাহিত করা হতো।
- **ব্রহ্মচর্য**: যাঁরা সহমরণে যেতেন না, তাঁদের জন্য রঘুনন্দন অত্যন্ত কঠোর নিরামিষ আহার, একাদশী ব্রত এবং মলিন বস্ত্র পরিধানের বিধান দিয়েছিলেন।
- **প্রমাণ**: জয়নন্দের *'চৈতন্যমঙ্গল'* কাব্যে তৎকালীন সমাজের কঠোর বিধবা-আচারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলন: নারীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি :-

তৎকালীন স্মার্ত সমাজ মনে করত নারী ও শূদ্রের আধ্যাত্মিক অধিকার পুরুষের চেয়ে কম। মহাপ্রভু এই ধারণাটি সমূলে উৎপাটন করেন। তাঁর মতে, ভক্তিপথে কোনো লৈঙ্গিক পরিচয় নেই; আত্মা চিরকালই পরমাত্মার অংশ। তিনি ঘোষণা করেন:

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

অর্থাৎ, হরিভক্তি থাকলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। এই একই ন্যায় তিনি নারীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন, যার ফলে নারী প্রথমবারের মতো পুরুষের ওপর নির্ভর না করে সরাসরি মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক প্রগতির অধিকার লাভ করে।

মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলন নারীদের হাতে জপমালা ধরিয়ে কেবল পরকালের মুক্তির পথ দেখায়নি, বরং ইহকালে তাঁদের **মানুষ হিসেবে মর্যাদা**, **শিক্ষার সুযোগ** এবং **নেতৃত্বের মঞ্চ** তৈরি করে দিয়েছিল। তাই সমাজতাত্ত্বিক বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন বাংলার নারী জাগরণের আদি ও প্রকৃত পুরুষ।

মহাপ্রভুর জন্মলগ্নে পরিবর্তনের সূচনা: শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া

মহাপ্রভুর নিজের পরিবারেই নারীর এক নতুন রূপ দেখা যায় যা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়:

১) **শচীমাতা**: তিনি কেবল মা ছিলেন না, নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপের ভক্তসমাজের 'মাতৃস্থানীয়' অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন।

২) **বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী**: নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পর তিনি যেভাবে কঠোর তপস্যা ও হরিনাম জপের মাধ্যমে দিনাতিপাত করতেন, তা নারীর আত্মশক্তির এক অনন্য প্রমাণ। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পূজা প্রচলিত হওয়া ছিল নারীর সামাজিক মর্যাদার এক বিরাট উত্তরণ।

মহাপ্রভুর জন্মলগ্নে নারীর অবস্থা : -

বিষয়ের ক্ষেত্র	**অবস্থানের প্রকৃতি**	**ঐতিহাসিক সূত্র/প্রমাণ**
সামাজিক	অবরোধবাসিনী, স্বতন্ত্র সত্তাহীন	চৈতন্যভাগবত, অদ্বৈত প্রকাশ
পারিবারিক	বহুবিবাহ ও কৌলীন্যের শিকার	নীহাররঞ্জন রায় (বাঙালীর ইতিহাস)
শিক্ষাগত	জ্ঞানার্জনে শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা	স্মৃতিশাস্ত্র ও লৌকিক প্রথা

বিষয়ের ক্ষেত্র	অবস্থানের প্রকৃতি	ঐতিহাসিক সূত্র/প্রমাণ
ধর্মীয়	কেবল লৌকিক ব্রত ও উপবাসে সীমাবদ্ধ	মঙ্গলকাব্য (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল)
আইনগত	সম্পত্তিতে অধিকারহীন	রঘুনন্দনের দায়ভাগ ও স্মৃতিবিধান

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার সমাজ ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। বিশেষ করে নারীর **'সেবাইত'** (সেবাধিকারিণী) এবং **'দীক্ষাগুরু'** হিসেবে আত্মপ্রকাশ ছিল তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক স্মার্ত সমাজের মূলে এক প্রবল আঘাত। এই বিবর্তনের ধারাটি নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

তাত্ত্বিক ভিত্তি: 'জীবে দয়া' ও লিঙ্গাতীত ভক্তি- মহাপ্রভু প্রচার করেছিলেন যে, আত্মা জড় প্রকৃতির (নারী বা পুরুষ) ঊর্ধ্বে। তাঁর দর্শনে ভক্তিই ছিল একমাত্র মাপকাঠি।

- **শ্লোক প্রমাণ**: *"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো..."* — মহাপ্রভুর এই ঘোষণার মাধ্যমে বর্ণ ও লিঙ্গভেদের ঊর্ধ্বে ভক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **বিবর্তন**: এর ফলে শাস্ত্রীয় নিগড় ভেঙে নারী প্রথমবার সরাসরি কৃষ্ণের 'সেবা' করার অধিকার পায়, যা আগে কেবল পুরুষ ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার ছিল।

সেবাইত হিসেবে নারীর উত্থান: বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী-

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপে নারী জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন তাঁর পত্নী **বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী**।

- **প্রথম শ্রীবিগ্রহ পূজা**: মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁর একটি দারুময় (কাঠের) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেবা শুরু করেন।
- **প্রভাব**: এটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একজন নারী (এবং বিধবা বেশে থাকা বিরহিণী) শ্রীবিগ্রহের প্রধান 'সেবাইত' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

করেন। তাঁর এই আদর্শ পরবর্তীকালে অসংখ্য বৈষ্ণব নারীকে মন্দিরের সেবার কাজে উৎসাহিত করে।

দীক্ষাগুরু হিসেবে বৈপ্লবিক ভূমিকা: জাহ্নবা দেবী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে নারীর **'দীক্ষাগুরু'** হিসেবে সর্বোচ্চ আসনে আরোহণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেন নিত্যানন্দ পত্নী **জাহ্নবা দেবী** (ঈশ্বরী)।

- **নেতৃত্ব**: মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধানের পর যখন বৈষ্ণব সমাজ কিছুটা দিশেহারা, তখন জাহ্নবা দেবী শক্ত হাতে আন্দোলনের হাল ধরেন।
- **দীক্ষাদান**: তিনি কেবল নারী নয়, বহু প্রথিতযশা পুরুষ ভক্তকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন নরোত্তম দাস ঠাকুরের মতো দিকপাল সাধক।
- **খেতুরীর মহোৎসব (১৫৮২ খ্রি.)**: এই বিশাল ধর্মসম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। যেখানে তৎকালীন রঘুনন্দনের বিধান অনুযায়ী নারীর ঘরের বাইরে আসাই দায় ছিল, সেখানে জাহ্নবা দেবী হাজার হাজার পণ্ডিত ও ভক্তের সামনে আচার্যের আসনে বসেন। এটি ছিল **'দীক্ষাগুরু'** হিসেবে নারীর শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত স্বীকৃতি।

অন্যান্য মহীয়সী নারী গুরু ও সেবাইত

জাহ্নবা দেবীর পথ ধরে আরও অনেক নারী বৈষ্ণব সমাজে গুরু এবং সেবাইতের মর্যাদা পান:

- **গঙ্গামাতা গোস্বামী**: তিনি ছিলেন রাজা নরেশের কন্যা, যিনি রাজকীয় সুখ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে সাধনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি পুরীতে গিয়ে রাধাকুণ্ডের সেবা ও শিষ্যদের দীক্ষা দেন। তাঁকে **'গোস্বামী'** উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যা সাধারণত পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।
- **হেমলতা ঠাকুরানী**: শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবী ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী এবং তেজস্বিনী গুরু। তিনি বহু পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

. বিবর্তনের পর্যায়ক্রমিক রূপরেখা

পর্যায়	**সময়কাল**	**নারীর অবস্থান ও ভূমিকা**
আদি পর্যায়	মহাপ্রভুর সময় (১৪৮৬-১৫৩৩)	নামসংকীর্তনে পরোক্ষ অংশগ্রহণ, গৃহে ভজন ও নাম জপ।
মধ্য পর্যায়	১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ	জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্বে প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান ও দীক্ষাগুরু হিসেবে স্বীকৃতি।
বিবর্তিত রূপ	১৭শ-১৮শ শতাব্দী	'মহান্ত' বা 'গোস্বামী' হিসেবে নারী ভক্তদের মন্দির পরিচালনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা।

সামাজিক প্রভাব ও তাৎপর্য

এই বিবর্তন কেবল ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না:

১)**শিক্ষা**: দীক্ষাগুরু হওয়ার প্রয়োজনে নারী বৈষ্ণবদের মধ্যে সংস্কৃত ও বাংলা শাস্ত্র পড়ার চল শুরু হয়, যা নারী শিক্ষার এক অপ্রাতিষ্ঠানিক বিপ্লব।

২)**অধিকার**: মন্দিরের 'সেবাইত' হওয়ার ফলে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নারীর হাতে আসে।

৩) **বিধবা মুক্তি**: বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে অনেক বিধবা নারী মস্তক মুণ্ডন ও তিলক ধারণ করে স্বাধীনভাবে ভজন ও ভ্রমণের অধিকার পান, যা তৎকালীন সমাজে ছিল অকল্পনীয়।

মহাপ্রভুর প্রবর্তিত এই ধারাটি ছিল একাধারে ধর্মীয় ও সামাজিক। তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরিরা প্রমাণ করেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও গুরুপদ কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। জাহ্নবা দেবী বা গঙ্গামাতা গোস্বামীরা কেবল ধর্ম প্রচার করেননি, তাঁরা মধ্যযুগীয় বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে নারীর অবদান :

নারী পদকর্তা: কলম ধরলেন অন্দরমহলের নারী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যেখানে নারীদের নাম প্রায় অনুপস্থিত, সেখানে বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা একঝাঁক প্রতিভাময়ী নারী কবির দেখা পাই। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আড়ালে নিজেদের বিরহ, তর্পণ এবং আধ্যাত্মিক আর্তি ব্যক্ত করেছেন।

- **মাধবী দাসী**: তিনি ছিলেন ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের আমত্য শিখি মাহিতির ভগিনী। মহাপ্রভু তাঁকে 'অর্ধপাত্র' হিসেবে গণ্য করতেন (অন্য তিন জন ছিলেন স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও শিখি মাহিতি)। তাঁর রচিত পদগুলো অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের এবং শাস্ত্রীয় গভীরতাসম্পন্ন।
- **রসময়ী দাসী**: তিনি বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার বিরহ বর্ণনায় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর পদে নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম আবেগগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
- **চন্দ্রাবলী ও অন্যান্য**: এছাড়াও অন্তত ২০-২৫ জন নারী পদকর্তার নাম পাওয়া যায় (যেমন— রতনমণি, সোনামণি), যাঁরা ভণিতার মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় রেখে গেছেন।

কীর্তন গায়িকা: কণ্ঠের জাদুতে আধ্যাত্মিক মুক্তি -

কীর্তন কেবল গান ছিল না, এটি ছিল একটি সামাজিক আন্দোলন। নারীরা কীর্তনের মাধ্যমে জনপরিসরে নিজেদের ভাব প্রকাশের সুযোগ পান।

- **বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও সখীগণ**: নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নেতৃত্বে একদল নারী ভক্ত নিয়মিত কীর্তন ও নাম জপ করতেন। এটি ছিল অন্দরমহলের নারীদের প্রথম 'সংগঠিত' আধ্যাত্মিক প্রকাশ।
- **কীর্তনের ঢঙ**: মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ে নারীরা কীর্তনের বিশেষ ঘরানা (যেমন— ময়মনসিংহ বা ঢপ কীর্তন) আয়ত্ত করেন। তাঁরা কেবল রাধাকৃষ্ণ লীলাই গাইতেন না, বরং কীর্তনের মাধ্যমে 'গৌরচন্দ্রিকা' বা মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার করতেন।

রাধা-তত্ত্বের মানবিকীকরণ-

বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা কেবল একটি চরিত্র নন, তিনি হলেন '**হ্লাদিনী শক্তি**'। নারী পদকর্তাগণ রাধার চরিত্রকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যা তৎকালীন সাধারণ বাঙালি নারীর জীবনের সাথে মিলে যায়।

- শাশুড়ি-ননদীর গঞ্জনা, কূলের ভয় এবং কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা—এই বিষয়গুলো নারী কবিদের লেখনীতে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

- তাঁরা রাধাকে কেবল একজন দেবী হিসেবে নয়, বরং একজন **বিদ্রোহী প্রেমিকা** হিসেবে তুলে ধরেছেন, যিনি সমাজের সব নিয়ম ভেঙে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে পারেন।

তাত্ত্বিক ও সম্পাদকীয় অবদান

বৈষ্ণব শাস্ত্র চর্চায় এবং পদাবলী সংকলনেও নারীদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অবদান ছিল।

- **জাহ্নবা দেবী**: তিনি পদাবলী কীর্তনের বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে অনেক পদ সংকলিত হয়েছিল। খেতুরীর উৎসবে যখন বিভিন্ন কীর্তনের সুর (যেমন— গরাণহাটি, রেনেটি) সমন্বিত হয়, তখন জাহ্নবা দেবীর অনুমোদন ও রুচি তাতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
- **শিক্ষয়িত্রী হিসেবে**: অনেক নারী বৈষ্ণব সহজিয়া বা মরমী দর্শনের গূঢ় তত্ত্বগুলো শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন, যা পরবর্তীকালে পদাবলী সাহিত্যের ভাবধারাকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রভাব ও সামাজিক তাৎপর্য

অবদানের ক্ষেত্র	**নারীর ভূমিকা ও প্রভাব**
ভাষা ও সাহিত্য	সংস্কৃতের বদলে সহজ বাংলা ভাষায় গভীর দর্শন প্রকাশ।
আবেগীয় প্রকাশ	বিরহ ও বাৎসল্য রসের মাধ্যমে নারীর অন্তর্নিহিত বেদনার শৈল্পিক রূপদান।
সাংস্কৃতিক মুক্তি	অবরোধ প্রথা ভেঙে গান ও কবিতার মাধ্যমে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা।
লোকজ সংযোগ	বাউল ও লোকজ গানের সাথে বৈষ্ণব পদাবলীর মেলবন্ধন ঘটানো।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নারীর অবদান কেবল কিছু পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ছিল নারীর '**বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তি**'। যেখানে শাস্ত্র নারীকে নীরব থাকতে বলেছিল, সেখানে পদাবলী কীর্তন তাকে কণ্ঠ দিয়েছিল। মাধবী দাসী বা রসময়ী দাসীদের কলমে যে প্রেম ও ভক্তি ফুটে উঠেছে, তা বাংলার সাহিত্যকে কেবল সমৃদ্ধই করেনি, বরং নারীকে সমাজের এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।

কীর্তন ও লোকসংস্কৃতি: নারীর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তির নবদিগন্ত-

কীর্তন ও আধ্যাত্মিক সমানাধিকার: শাস্ত্রীয় ভিত্তি

বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তিই মুখ্য উপজীব্য, যেখানে লিঙ্গভেদ গৌণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিপথের সর্বজনীনতা স্পষ্ট করেছেন:

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥" [১১]

অর্থাৎ: হে পার্থ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ—যাঁরাই আমার শরণাপন্ন হন, তাঁরাই পরম গতি লাভ করেন।

এই শ্লোকটি প্রমাণ করে যে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে নারী বা শূদ্রের কোনো বাধা নেই। তৎকালীন শাস্ত্রশাসিত সমাজে এই ঘোষণা ছিল চূড়ান্ত বৈপ্লবিক, যা নারীকে পুরুষের সমান্তরাল আধ্যাত্মিক অধিকার প্রদান করে।

সামাজিক বিদ্রোহ ও নেতৃত্ব: জাহ্নবা দেবী-

নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব সমাজের হাল ধরেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের খেতুরীর মহোৎসবে তাঁর সভাপতিত্ব ছিল বিশ্ব ইতিহাসে নারীর নেতৃত্বের এক অনন্য দলিল। [১২] জাহ্নবা দেবী কেবল গৃহিণী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সার্থক দীক্ষাগুরু এবং তাত্ত্বিক নেতা। পুরুষশাসিত ধর্মীয় কাঠামোতে তাঁর এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নারীজাগরণের এক আদি উদাহরণ।

মীরাবাঈ: শৃঙ্খল ভাঙার সুর

ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ মীরাবাঈ রাজকীয় বৈভব ও পিতৃতান্ত্রিক 'কুল-মর্যাদা'র শৃঙ্খল ত্যাগ করে পথে নেমেছিলেন। তাঁর পদে সামাজিক বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়:

"পগ ঘুঙুর বাঁধ মীরা নাচি রে।

লোক কহে মীরা ভঈ বাবরী, কুলনাশিনী কহে সঈ রে॥" [১৩]

মীরাবাঈ প্রমাণ করেছিলেন যে, ঈশ্বরপ্রেম বা আত্মিক অনুসন্ধানের পথে রাজকীয় শাসন বা পারিবারিক লোকলজ্জা কোনো বাধা হতে পারে না।

সুফিবাদের প্রভাব: রাবেয়া বসরী ও মরমী প্রেম

সুফি দর্শন নারীকে 'প্রেম' ও 'ত্যাগের' সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত সুফি সাধিকা রাবেয়া বসরী ভয়ের ধর্মতত্ত্বকে অস্বীকার করে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার (**ইশক-এ-হাকিকি**) কথা বলেন। তিনি প্রচার করেন যে, স্রষ্টার সাথে মিলনে লিঙ্গ কোনো অন্তরায় নয়; বরং পবিত্র হৃদয়ই মিলনের একমাত্র পথ। [১৪] এই সুফি মরমী ভাবধারা বাংলার সহজিয়া ও বাউল দর্শনে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।

লোকসংস্কৃতিতে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠ

বাউল গান ও মৈমনসিংহগীতিকার মতো লোকায়ত ধারাগুলোতে নারীকে কেবল মানুষ হিসেবে নয়, বরং 'শক্তি' ও 'প্রকৃতি' রূপে আরাধনা করা হয়। লালন শাহের দর্শনে লিঙ্গভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে 'মানুষ ভজনা'র ডাক দেওয়া হয়েছে:

"লিঙ্গ দেখে হয় না বিচার, ভক্তি দেখে হয় রে সারা।" [১৫]

একইভাবে মৈমনসিংহগীতিকার মলুয়া বা মহুয়ার মতো চরিত্রগুলো তৎকালীন সমাজের অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর মরণজয়ী সংগ্রামের সাক্ষ্য দেয়। [১৬]

আধ্যাত্মিক সমানাধিকারের মূল ভিত্তি (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে লিঙ্গ বা জাতিভেদ যে আধ্যাত্মিক পথে বাধা নয়, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই শ্লোকটি:

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়।।" *(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা ৮:১২৮)*

- **প্রাসঙ্গিকতা:** এটি প্রমাণ করে যে নারীরাও আধ্যাত্মিক গুরু বা পথপ্রদর্শক হওয়ার পূর্ণ অধিকারী।

রাধাভাব ও নারীর শ্রেষ্ঠত্ব

মহাপ্রভুর 'রাধাভাব' গ্রহণ ছিল নারীর অভ্যন্তরীণ শক্তি ও প্রেমের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি:

"রাধিকার প্রেম—বিভূ, কাম—অন্ধকার। কামে-প্রেমে বহুত অন্তর।।"

- **প্রাসঙ্গিকতা:** নারীর প্রেমকে কামের ঊর্ধ্বে এক পবিত্র ও ঐশ্বরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার এই দর্শন নারীমুক্তির এক অন্যতম সোপান।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসার ও স্বাধীনতা

চণ্ডীদাসের পদে নারীর চিরন্তন আকুতি ও মুক্তির সুর:

"শুনহ মানুষ ভাই,

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

প্রাসঙ্গিকতা: এই মানবতাবাদই ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে দেওয়ার মূল মন্ত্র। সহজিয়া দর্শনে নারীর স্থান (চণ্ডীদাস)

সহজিয়া বৈষ্ণব মতে নারীকে 'প্রকৃতি' বা শক্তির আধার হিসেবে দেখা হতো:

"রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।"

প্রাসঙ্গিকতা: এটি সামাজিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে নারীর স্বরূপ বা দিব্যসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

"গদাধর পণ্ডিত—গৌরাঙ্গের কান্তা।

যাঁর ভাব লৈয়া প্রভু হইলা একান্তা।।"

উপসংহার স্বরূপ: শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের 'রাধাভাব' আসলে মধ্যযুগীয় বাংলার নারীত্বের এক অলিখিত স্বীকৃতি। যেখানে নারীদের শাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে গদাধর পণ্ডিতের মাধ্যমে 'নারীভাব'ই আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ আসন লাভ করেছিল। এটিই হলো "শাস্ত্রীয় নিগড় থেকে লোকায়ত আধ্যাত্মিক সমানাধিকারের বিবর্তন"-এর মূল চাবিকাঠি।

উপসংহার: শাস্ত্রীয় নিগড় থেকে লোকায়ত মুক্তিসামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ যখন একদিকে স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন এবং পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীলতার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল , ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলন এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। এই আন্দোলন কেবল একটি ধর্মীয় মতবাদ ছিল না, বরং তা ছিল শৃঙ্খলিত মানবতার মুক্তির এক অবারিত আহ্বান।গবেষণার এই পর্যায়ে আমরা কয়েকটি প্রধান সত্যে উপনীত হই:আধ্যাত্মিক সমানাধিকার: মহাপ্রভু ঘোষণা করেছিলেন যে ভক্তিপথে কোনো লৈঙ্গিক বা বর্ণভেদ নেই। তাঁর এই দর্শনের ফলেই নারী প্রথমবারের মতো পুরুষের ওপর নির্ভর না করে সরাসরি মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক প্রগতির অধিকার লাভ করে।নারীর নেতৃত্ব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা: জাহ্নবা দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং গঙ্গামাতা গোস্বামীর মতো মহীয়সী নারীগণ প্রমাণ করেছিলেন যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও গুরুপদ কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তাঁরা কেবল ধর্ম প্রচার করেননি, বরং মধ্যযুগীয় বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন।বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি: যেখানে শাস্ত্র নারীকে নীরব থাকতে বলেছিল, সেখানে বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তন তাঁদের কণ্ঠ দান করেছিল। নারী পদকর্তাদের কলমে প্রেম ও ভক্তির যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা বাংলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নারীকে সমাজের এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।গদাধর পণ্ডিত ও রাধাভাবের সার্থকতা: শ্রীপাট ভরতপুরের ধূলিকণায় মিশে থাকা শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের 'রাধাভাব' আসলে নারীত্বের এক অঘোষিত ও সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। তাঁর এই 'সেবাভাব' বা 'নারী-সুলভ কোমল ভক্তি'ই যে আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ শিখর, তা লোকায়ত মানসে নারীমুক্তির এক শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।পরিশেষে বলা যায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন কেবল মন্দির বা সংকীর্তনের আঙিনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল এক সামাজিক বিপ্লব যা নারীর মানবিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। বর্তমান গবেষণাপত্রটি সেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক দর্পণ হয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরেছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা :-

১. **মনুস্মৃতি**: অধ্যায় ৫, শ্লোক ১৪৮ (নারীর পরাধীনতা ও অভিভাবকত্ব প্রসঙ্গে)।

২. **মনুস্মৃতি**: অধ্যায় ৫, শ্লোক ১৫৫ (পতিসেবার মাহাত্ম্য ও স্বতন্ত্র যজ্ঞের নিষেধ)।

৩. **স্মৃতিসংহিতা**: লৌকিক আচার ও বেদাধ্যয়নে নারী-শূদ্রের অধিকার নিষেধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন।

৪. **মহাভারত**: অনুশাসন পর্ব (নারীর স্বভাব ও ত্রুটি বিষয়ক বিতর্কিত আলোচনা)।

৫. **নীহাররঞ্জন রায়**: *বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং (পাল ও সেন যুগের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ)।

৬. **যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি**: আচার অধ্যায় (নারীর সুরক্ষা ও অন্দরমহলে নিয়ন্ত্রণের বিধান)।

৭. **চর্যাপদ**: পদ নং ১০, ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *Buddhist Mystic Songs*।

৮. **চাণক্যনীতি**: অধ্যায় ১৬, শ্লোক ১ (নারীর স্বভাবজাত দোষ বর্ণনা)।

৯. **শ্রীমদ্ভগবদগীতা**: অধ্যায় ৯, শ্লোক ৩২ (ভক্তিযোগে নারী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সমান অধিকার)।

১০. **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**: মধ্যলীলা (মহাপ্রভুর সাম্যবাদী ও ভক্তি দর্শনের আকর)।

১১. **শ্রীমদ্ভগবদগীতা (৯/৩২)**: ভক্তিযোগের সর্বজনীন সাম্যের প্রধান আকর। এটি তৎকালীন বৈষম্যমূলক স্মার্ত বিধানের বিপরীতে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে।

১২. **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অদ্বৈত প্রকাশ**: জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্ব ও খেতুরীর উৎসবের ঐতিহাসিক বিবরণ। (দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*)।

১৩. **মীরাবাঈ কি পদাবলী**: উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের প্রধান আকর গ্রন্থ। (উদ্‌ধৃতি: লোকসংস্কৃতি ও নারীর স্বাধিকার প্রসঙ্গে)।

১ ৪. **Sufi Women (Dr. Javad Nurbakhsh)**: সুফি সাধিকা রাবেয়া বসরীর জীবনী ও তাঁর 'নিঃস্বার্থ প্রেম' দর্শনের বিশ্লেষণ।

১ ৫. **লালন সমগ্র (ড. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত)**: লালন শাহের গানে লৈঙ্গিক বৈষম্য নিরসন ও মানবতাবাদের জয়গান।

১ ৬. **মৈমনসিংহগীতিকা (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত)**: বাংলার লোকসংস্কৃতিতে নারীর তেজস্বিতা ও সমাজ-বিদ্রোহের সাহিত্যিক দলিল।

গ্রন্থতালিকা : -

১. ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা গ্রন্থ:

- **রায়, নীহাররঞ্জন।** (১৪১২ বঙ্গাব্দ; পুনর্মুদ্রণ)। *বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। (পৃষ্ঠা: ৫২৭-৫৩০; পাল ও সেন আমলের সমাজ ও নারীর অবরোধ প্রথা বিশ্লেষণ)।
- **সেন, দীনেশচন্দ্র।** (১৯৩৫; প্রথম প্রকাশ)। *বৃহৎ বঙ্গ* (১ম ও ২য় খণ্ড)। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। (পৃষ্ঠা: ৪৫০-৪৬০; কৌলীন্য প্রথা ও জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্ব)।
- **সেন, ড. সুকুমার।** (১৯৯১; সংস্করণ)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। (পৃষ্ঠা: ২৫৫-২৬০; মাধবী দাসী ও নারী পদকর্তাদের অবদান)।
- **ভট্টাচার্য, সুখময়।** (১৯৯২; সংস্করণ)। *মহাভারতের সমাজ*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী। (পৃষ্ঠা: ১৬০-১৮০; অনুশাসন পর্বে নারীর অবস্থান)।

২. শাস্ত্রীয় ও ভক্তি সাহিত্যের আকর গ্রন্থ:

- **কবিরাজ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস।** (২০০৩; সংস্করণ)। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত)। কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী। (মধ্যলীলা; পৃষ্ঠা: ২০০-২১৫; মহাপ্রভুর সাম্যবাদী দর্শন ও নারী ভক্ত প্রসঙ্গ)।
- **ঠাকুর, বৃন্দাবন দাস।** (২০০৫; সংস্করণ)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: নবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ। (আদি খণ্ড; পৃষ্ঠা: ৫০-৬০; মহাপ্রভুর জন্মলগ্নে নবদ্বীপের চিত্র)।
- **স্বামী, এ.সি. ভক্তিবেদান্ত।** (১৯৭২; সংস্করণ)। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*। মুম্বই: ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট। (অধ্যায় ৯, শ্লোক ৩২; পৃষ্ঠা: ৪৪৫-৪৪৭)।

- **শহীদুল্লাহ, ড. মহম্মদ (সম্পাদিত)।** (১৯৬০)। *Buddhist Mystic Songs* (চর্যাপদ)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। (পদ নং ১০; ডোম্বী ও সহজিয়া দর্শন)।

৩. লোকসংস্কৃতি ও সুফিবাদ:

- **সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পাদিত)।** (১৯২৩; ১ম প্রকাশ)। *মৈমনসিংহগীতিকা*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। (মলুয়া ও মহুয়া পালা; পৃষ্ঠা: ৮০-১১০)।
- **চক্রবর্তী, ড. সুধীর (সম্পাদিত)।** (২০০৩)। *লালন সমগ্র*। কলকাতা: প্রতিভাস। (লালন শাহের দর্শনে লিঙ্গ সাম্য; পৃষ্ঠা: ১৫০-১৬০)।
- **Nurbakhsh, Dr. Javad.** (1990). *Sufi Women.* New York: Khaniqahi Nimatullahi Publications. (Rabia al-Adawiyya; Pages: 15-35).

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি :

অজয় কুমার দে (প্রণবানন্দন) গবেষক, কবি ও রসায়নবিদ

ORCID iD: 0009-0009-1046-3555

শ্রী অজয় কুমার দে (সাহিত্যিক নাম '**প্রণবনন্দন**') মুর্শিদাবাদের সন্তান , অধিকারী গবেষক ও সাহিত্যিক। । রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও বাংলার বৈষ্ণব ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁকে একজন নিরলস গবেষকে পরিণত করেছে। দীর্ঘ ১২ বছরের পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তিনি ডিজিটাল এবং মুদ্রিত উভয় মাধ্যমেই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় ব্রতী।ব্যক্তিজীবনে তিনি সাইবার অপরাধ তদন্ত এবং সাংবাদিকতায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে প্রাচীন ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন করাই তাঁর লক্ষ্য। 'প্রণবানন্দন' ছদ্মনামে তিনি নিয়মিত লোকসংস্কৃতি, ধর্মদর্শন এবং সামাজিক বিবর্তন নিয়ে লিখে চলেছেন। তাঁর লেখায় যেমন বিজ্ঞানের যুক্তিগ্রাহ্যতা থাকে, তেমনি থাকে আধ্যাত্মিক চেতনার গভীরতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব, বিশেষ করে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এবং বৈষ্ণব পদাবলীর বিবর্তন নিয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য সুপরিচিত। তাঁর গবেষণা ও সাহিত্যিক কর্মধারার স্বীকৃতিস্বরূপ 'নজরুল পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি উইকিপিডিয়ার একজন সক্রিয় সম্পাদক এবং 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব' ও 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর' জীবনদর্শন বিষয়ক একাধিক ডিজিটাল গ্রন্থের প্রণেতা।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও ই-বুক :-

- **নবদ্বীপ ধাম: দ্য অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল** (**২০২৬**): বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র নবদ্বীপের ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনদর্শন নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আকর গ্রন্থ।
- **সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত** (**২০২৬**): গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আধ্যাত্মিক ধারা কেন্দ্রিক গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- **বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস ও শ্রীপাট ভরতপুর** (২০২৫): মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত শ্রীপাট ভরতপুরের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব এবং সেখানে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে গবেষণামূলক কাজ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বাংলার নারীমুক্তি

শাস্ত্রীয় নিগড় থেকে লোকায়ত আধ্যাত্মিক সমানা-নাধিকারের বিবর্তন

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণা প্রবন্ধটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করে। একদিকে স্মৃতিশাস্ত্র ও পিতৃতান্ত্রিক কঠোরতা কীভাবে নারীর অধিকারকে সংকুচিত করেছিল এবং অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলন ও লোক সংস্কৃতি কীভাবে নারীর মুক্তির পথ প্রশস্ত তাহার একটি তুলনামূলক চিত্র। বৈষ্ণবধর্ম, সুফিবাদ এবং মৈমনসিংহ গীতিকার ন্যায় লোকজ ঐতিহ্যের আলোকে নারীর মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক বৈপ্লবিক পর্যায় এখানে আলোচিত হয়েছে।

গবেষক:

শ্রী অজয়কুমার দে (প্রণবনন্দন)

গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

9 781827 265432